খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১৫
Vol. 13, No. 15

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২১
June 2021

বাংলাদেশের মতুয়া সম্প্রদায়: স্থানীয় সমাজ কাঠামোতে সহাবস্থানের স্বরূপ ও প্রতিবন্ধকতা

মোঃ খালেদ বিন অলি ভূঁইয়া , ফাতেমা আরশি
এবং
ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া

মতুয়া সম্প্রদায় কৃত্যা অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

The Matua Community of Bangladesh: Ambivalent Coexistence within Local Social Frameworks

Md. Khaled Bin Oli Bhuiyan, Fatema Aarshe
and
Carola Erika Lorea

Abstract

The Matua community is a large and yet little-known religious community. Initially born out of popular Vaishnava devotionalism in the south of East Bengal, the Matuas developed a separate religious identity in the middle of the nineteenth century. Today, there are about 9-10 million Matua followers in Bangladesh, constituting the majority of the Hindu population in the country. Because of complex historical and political reasons, the lives and practices of the Matua movement remained unexplored by Bengali scholarship. With its founding saints Harichand Thakur (1812 - 1878) and Guruchand Thakur (1847 - 1937), the Matua movement started as a caste-based mobilization addressing the social aspirations of the Namashudra caste. After the Partition of India and Pakistan (1947) the Matua community had lost its territorial integrity. Massive displacement took place because of communal riots and increasingly difficult conditions for the Hindu minority in East Pakistan. Today, according to Matua Mahasangha leaders, the Matua community counts about 50 million members, who live mostly in India. During the Covid-19 pandemic, a research team supervised by Dr. Carola Lorea has studied the healing practices of the Matua community and their religious responses to the pandemic, as part of a larger project titled "Religion Going Viral: Pandemic Transformations of Religious Lives and Ritual Performances in Asia", sponsored by the Asia Research Institute, National University of Singapore. The primary sources of this article derive from Dr. Lorea's long term research and multi-site fieldwork with the Matua community, combined with the new ethnographic data gathered by her research assistants, Md. Khaled Bin Oli Bhuiyan and Fatema Aarshe , through interviews and netnography with Matua practitioners over the course of the Covid pandemic.

মতুয়া আন্দোলন শুরুতে ছিল নমঃশূদ্রদের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলন বৈদিক ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার ও রীতিনীতিকে বর্জন করার মধ্যদিয়ে নমঃশূদ্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি নির্মাণের প্রয়াস চালায়। পরবর্তীতে সমস্ত দলিত, পতিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মতুয়া আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা হয়। এর ফলে এই সমস্ত লোকজন আত্মউপলব্ধির একটি পরিসর খুঁজে পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মতুয়া আন্দোলনের অনুসারীরা বৈদিক ধর্মের বৈষম্যমূলক জাতিবর্ণ প্রথাকে অস্বীকারপূর্বক নিজেদের জন্য আলাদা পরিচিতি নির্মাণের কথা ভাবতে শুরু করে। মূলত হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২ - ১৮৭৮) ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কার ও চর্চার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ 'মতুয়া' নামে ভক্তিবাদী মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন। মতুয়া লেখকেরা জানান যে, সেন রাজবংশের শাসক বল্লাল সেনের রাজত্বের (১১৬০-১১৭৯) পূর্ব পর্যন্ত নমঃশূদ্ররা ছিল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। বাংলা অঞ্চলে বৈদিক ধর্মের প্রসার শুরু হলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করে নিম্নবর্ণে স্থান লাভ করে। কিন্তু নমঃশূদ্ররা বৈদিক ধর্মগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তারা অনেক নিপীড়নের শিকার হয় এবং তাদের চন্ডাল হিসেবে অবহিত করা হয়। অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণের জন্য কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে (Chakraborti, 1985)। কেউ কেউ বৈদিক ধর্ম মেনে নিলেও ব্রাহ্মণেরা তাদের ধর্মীয় "অন্য" হিসেবে নির্মাণ করে এবং তাদের পূর্ণ অধিকার দেয় না। যদিও চণ্ডাল বা নমঃশূদ্ররাই ছিল বাঙালি হিন্দু সমাজের বড় অংশ, কিন্তু তারা অচ্ছুৎ বলে সমাজে ঘৃণিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে কোনো ধর্ম সংস্কারকারক তৎকালীন ব্রাহ্মণদের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি বিশেষ করে নমঃশূদ্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রুখে দাঁড়ায়। বাংলায় এমনই ধর্ম সংস্কারকারীদের একজন ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় কাশিয়ানি উপজেলার সাফলাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ববঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক একাত্মতা নির্মাণের মধ্য দিয়ে মতুয়া সম্প্রদায় গড়ে তোলেন।

মতুয়া ধর্মীয় নেতাদের মতানুসারে, বর্তমানে মতুয়া সম্প্রদায়ের ৫ কোটি (৫০ মিলিয়ন) অনুসারী রয়েছে। এই জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তাদের ধর্ম প্রচারক, তীর্থস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পুস্তক এবং চর্চার মাধ্যমে একটি কাল্পনিক সীমানাবিহীন সম্পর্কের মাধ্যমে তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত (Lorea 2020, p. 1)।

উল্লেখ্য, মতুয়া আন্দোলন শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ছেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭ - ১৯৩৭) নমঃশূদ্রদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মতুয়া আন্দোলনকে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেন। যেখানে নমঃশূদ্রদের শিক্ষার অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি নমঃশূদ্রদের সরকারি চাকরিতে প্রবেশের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করেন। মতুয়ারা মনে করে যে, নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারীদেরকে ধাত্রী বিদ্যা ও নার্সিং ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময়কাল পর্যন্ত নমঃশূদ্রেরা সামাজিকভাবে 'চন্ডাল' হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে গুরুচাঁদ ঠাকুরের চেষ্টায় তাদেরকে 'নমঃশূদ্র' নামকরণ করা হয়। তাদের এই সংস্কার আন্দোলন লোক সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি বহুত্ববাদী পরিচয় নির্মাণ করেছে, যা মানবিক, উদারনৈতিক এবং প্রগতিশীল (Biswas, 2018)।

উপনিবেশিক সময়ে ব্রিটিশরা আদমশুমারি করার সময় সমগ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভাগ করে। কেননা, তাদের ধারণা ছিল অন্যান্য যে জাতিগোষ্ঠী আছে তা হিন্দু বর্ণপ্রথার কারণে সৃষ্ট। ব্রিটিশরা বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করলেও বর্ণপ্রথার মধ্যকার পরিবর্তন ও গতিশীলতাকে অনুধাবন করতে পারেনি। প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করার মধ্যদিয়ে শ্রীনিভাস সংস্কৃত্যায়ন (Sanskritization) দেখান, বর্ণাপ্রথা কোনো স্থির প্রক্রিয়া নয়, বরং বিভিন্ন বর্ণের মানুষেরা প্রতিনিয়ত নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণে যাবার চেষ্টা করে (Srinivas, 1972)। এরই মধ্যে যখন ব্রিটিশ আধুনিকায়ন প্রকল্প সামনে আসে তখন নিম্নবর্ণের মানুষেরা ব্রিটিশদের আধুনিকায়নের সাথে পুরোপুরি একাত্মতা প্রকাশ করতে পারে না, আবার হিন্দু ভদ্রলোকেরাও তাদের রীতিনীতি সম্বলিত জীবনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, বরং সংস্কারগুলোকে আঁকড়ে ধরে। গবেষকের আলোচনা থেকে দেখা যায়, ব্রিটিশদের 'হাইব্রিড মডার্নিটি'র ধারণা সাংস্কৃতিক ভিন্নতাসমূহের জন্য কোনো আলাদা পরিসর তৈরি করতে পারে না (Bandyopadhay, 2004)। ফলে দলিত বা নমঃশূদ্রদের নিয়ে আলোচনা ইতিহাস নির্দিষ্টভাবেই প্রান্তিক হতে থাকে এবং তাদের আন্দোলন সংগ্রামের গল্প জনপরিসরে তেমন গুরুত্বের সাথে উঠে আসে না।

অল্প কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন, আবুল বারকাত) বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বাংলাদেশের গবেষকেরা খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। আবুল বারকাত বলেন, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে প্রায় এক কোটি তেরো লাখ (১১.৩ মিলিয়ন) হিন্দু জনগোষ্ঠী বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায় (Barkat 2016)। বাংলাদেশের মূলধারার সমাজের মানুষজন হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম চর্চা ও সামাজিক জীবন নিয়ে খুব একটা অবহিত না। ১৯৬৪ থেকে ২০০৭ সাল সময়কাল পর্যন্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর জনজীবনে বৈষম্যমূলক আইনের প্রভাব নিয়ে করা আবুল বারকাতের গবেষণা আমাদেরকে দেখায় যে, শত্রু সম্পত্তি আইন (পরবর্তীতে ১৯৭৪

সাল থেকে অর্পিত সম্পত্তি আইন) ছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বঞ্চনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দীর্ঘকালব্যাপী টিকিয়ে রাখার প্রধান হাতিয়ার। এর ফলে একটি বড় সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী অভিবাসিত হয় (Barkat et al. 2008)। আবুল বারকাতের এই গবেষণা অনুসারে, এই আইনের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী (১২ লক্ষ গৃহস্থলি) তাদের সম্পত্তি হারায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ে দলিত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতাকে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা ও হিন্দু বর্ণপ্রথা দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি আমাদের সামনে উঠে আসে না। বাংলাদেশে বর্ণপ্রথা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে গত কয়েক বছরে। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক নাসির উদ্দিন মনে করেন, বৈষম্যমূলক বর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হলেও এই অঞ্চলে তা হয়নি। বর্ণপ্রথাকে বাংলাদেশি মুসলিম সমাজের জন্য বড় সমস্যা হিসেবে মনে না করার প্রবণতা এবং মুসলমানদের সমরূপ পরিচিতি নির্মাণের প্রবণতা 'culture of denial' কে সামনে নিয়ে আসে। ফলাফলস্বরূপ বাংলাদেশে বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে বিদ্যমান দলিতদের সমস্যা নেই বলে মনে করা হয় (Uddin, 2017)। অপরদিকে সমকালীন ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষিতে যে আলাপ আলোচনাগুলো আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, সেখানে দলিত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতাকে খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। যার ফলাস্বরূপ বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়ের বৈষম্যের গল্পগুলো সামনে আসে না। নমঃশূদ্র বা দলিত অধ্যয়নের এইরূপ প্রবণতার কারণে দেখা যায় যে, মতুয়া আন্দোলনের সূত্রপাত বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও মতুয়া আন্দোলনের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও সমকালের নিরিখে বহুমাত্রিক পাঠের জায়গাটি অনুপস্থিত। ভারতে দলিত আন্দোলন, ভোটের রাজনীতি, দেশভাগ, পুনর্বাসন, উদ্বাস্তু সমস্যা ও নাগরিকত্ব ইস্যু ইত্যাদির প্রেক্ষিতে মিডিয়া ও একাডেমিক পরিসরে কিছুটা গুরুত্ব পেলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি প্রায় অনুপস্থিত। এই প্রবন্ধটিতে মূলত দেখার চেষ্টা করা হবে মতুয়া সম্প্রদায় কীভাবে বর্তমান ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সমাজ কাঠামোতে সহাবস্থান করছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এইপ্রবন্ধটি একটি গবেষণাপ্রকল্প "Religion Going Viral: Pandemic Transformations of Religious Lives and Ritual Performances in Asia"-এর অংশ। এটি পরিচালিত হয় এশিয়া রিসার্চ ইন্সিটিউট, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর থেকে। আমরা ছয়জন তরুণ গবেষকের একটি দল ড. ক্যারোলা এরিকা লোরেয়ার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামান দ্বীপ থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করি। গবেষণার মধ্যদিয়ে বোঝার চেষ্টা করি বাংলাদেশ ও ভারতে বসবাসকারী মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালীন সময়ে কি ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং স্বাস্থ্য নির্দেশনা অনুসরণ ও রোগ নিরাময়ের জন্য তারা কোন ধরনের

পদ্ধতি ও ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা দূরবর্তী এথনোগ্রাফি (remote ethnography) গবেষণা পদ্ধতির সহায়তা নিই। করোনা মহামারীর কারণে স্বয়ং উপস্থিত থেকে মাঠকর্ম করা সম্ভব হয়নি বিধায় আমরা মোবাইল-ফোনে সাক্ষাৎকার এবং নেটনোগ্রাফি বা ডিজিটাল এথনোগ্রাফির (Pacheco-Vega 2020; Lupton 2020) পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেছি।

করোনাকালীন সময় মতুয়াদের অনেক ধরনের অনলাইন কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই অনলাইন কার্যক্রমগুলোতে সকল শ্রেণির মতুয়াদের উপস্থিতি সমান ছিল না। মতুয়াদের বড় অংশ যেহেতু কৃষিজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষ এবং অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। তাই তাদের সকলের পক্ষে স্মার্ট ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, দূরবর্তী এথনোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার করে এই ধরনের মানুষজনের কাছে পৌঁছানো অনেক কঠিন। শ্রেণিভিত্তিক অসমতার পাশাপাশি লিঙ্গভিত্তিক অসমতা লক্ষণীয়। নারী উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। একজন মূল তথ্যদাতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তিনি তার মাকে সাক্ষাৎকারের জন্য কথা বলতে দিবেন কিনা? তিনি প্রথমে দ্বিধায় পড়েছিলেন এবং বেশ কিছু সময় পর রাজি হয়েছিলেন। তার মায়ের সাথে কথা বলার সময় যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—তার নিজের মোবাইল ফোন আছে কিনা? তিনি তখন কিছুক্ষণ নীরবতার পর উত্তর দিয়েছিলেন—তার কাছে ফোন রয়েছে। তবে তার সন্তানেরা করোনার কারণে বাড়িতে থাকায় তিনি ব্যবহার করেন না। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—কোন নাম্বারে তাকে ফোন করা উচিত? তার ছেলে পাশ থেকে বলল, "অবশ্যই আমার নাম্বার থেকে।" তখন তিনি একই কথা বললেন। একই ধরনের বিষয় পরিলক্ষিত হয় নারী গোঁসাইদের ক্ষেত্রেও। একজন নারী গোঁসাই জানান, তিনি নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করেন। কিন্তু তার নিজের কোনো একাউন্ট নেই, স্বামীর ফেসবুক একাউন্ট থেকে সকল কিছু দেখেন। যোগাযোগ মাধ্যমে নারীদের অনুপস্থিতি, তাদের মতামতের অভাব একদিকে যেমন উত্তরদাতা এবং তাদের মতামত খুঁজে নিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে আবার একই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে পুরুষতান্ত্রিক করে তোলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ সমান না এবং এই সকল প্রযুক্তিগুলো সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

মতুয়া সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান সমূহ

মতুয়াদের বেশীরভাগ ধর্মানুষ্ঠান (যেমন, হরিনাম সংকীর্তন), আচারানুষ্ঠান, রীতিনীতি ও প্রতীকসমূহ চৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৪) বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলনকে অনুসরণ করে গৃহীত হয়েছে। অনেক মতুয়ারা মনে করেন, হরিচাঁদ ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী অবতার।

বাংলা অঞ্চলে বৈদিক ধর্মের প্রভাব বিস্তার করার ফলে যে সকল স্থানীয় লোকজন বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করে, তাদেরকে চণ্ডাল হিসেবে নামকরণ করা হয়। এই চণ্ডালরা অস্পৃশ্য। তাদের ছুঁলে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের ধর্মীয় পন্থা অবলম্বন করে পবিত্র হতে হয়। বৈদিক ধর্ম বাংলা অঞ্চলে তার শক্ত অবস্থান তৈরি করার পর লৌকিক ধর্ম চর্চাকারী চণ্ডাল বা অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের ধর্ম চর্চার অধিকার হারায়। এই জন্য চণ্ডাল বা অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের ধর্ম চর্চা তাদের নিজেদের পরিসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্ম চর্চার সামাজিক স্বীকৃতি তাদের ছিল না। তাই তারা সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়াই সম্পাদন করতো। তাদের উৎসবগুলো ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী চর্চার বাইরে। এই বিষয়টি মতুয়াদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মতুয়ারা নিজস্ব রীতিতে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই আচারগুলোকে মতুয়ারা মাঙ্গলিক ক্রিয়া বলে থাকে। এই প্রসঙ্গে মনোশান্ত বিশ্বাস বলেন, মতুয়া আদর্শ শুধুমাত্র ধর্মীয় বার্তা প্রদান করে না, এটি একটি ডিসকোর্স তৈরি করে যা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে (Biswas 2018, p. 235)। এই প্রতিক্রিয়াটি মতুয়াদের ধর্ম চর্চার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধের এ অংশে মতুয়াদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় চর্চা ও বিশ্বাসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বুধবার মতুয়াদের সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিন। এইদিন হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন যে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় সেটিকে বলে হরিসভা। কোন কোন স্থানে হরিবাসর বলা হয়ে থাকে। হরিসভার তিনটি অংশ। প্রথম অংশে বন্দনা গাওয়ার পরে শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত পাঠ করা হয়। *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত* হরিঠাকুরের জীবনীগ্রন্থ এবং মতুয়াদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ (সরকার ১৯১৬)। তারপরে জীবন ও কর্মের উপর বারোটি উপদেশ অর্থাৎ দ্বাদশ আজ্ঞা পাঠ। তারপর হচ্ছে সংগীত। এটিকে *হরিসংগীত* বা *মতুয়া সংগীত* বলা হয়[১]। এই সংগীতে হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও কর্মের উপর গুণকীর্তন করা হয়। তার পাশাপাশি আরও অন্যান্য ধারার গান যেমন দেহতত্ত্ব, স্থান মাহাত্ম্যের গান ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। শ্রীশ্রী মহাসঙ্কীর্তন হল মতুয়া লোক সাহিত্য বা লোক গীতির উপর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ[২]। এই গ্রন্থে মতুয়া মতবাদ এবং তার সাধনপদ্ধতি হরিনাম কীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে মতুয়া ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তাদের সপ্তাহিক এই আয়োজনে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। ধর্ম গুরু হওয়ার জন্য বিশেষ জাতিবর্ণের হতে হয় না, আবার ধর্মগুরু ছাড়াও এই মাঙ্গলিক ক্রিয়া পালন করা যায়। কেউ চাইলে নিজ ঘরে হরিসভার আয়োজন করতে পারে। প্রায় সকল মতুয়ার ঘরেই একটি হরিমন্দির আছে। মন্দিরে হরি এবং শান্তি মাতা যুগলে আরাধিত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যাতে পুরুহিত ছাড়াই মতুয়ারা ধর্ম চর্চা করতে পারে।

---

১ সরকার, অশ্বিনী কুমার। (১৯১৫)। *শ্রীশ্রী হরিসংগীত*। ওড়াকান্দি: ঠাকুরবাড়ি।

২ সরকার, তারকচন্দ্র। (১৯০০)। *শ্রীশ্রী মহাসংকীর্তন*। ওড়াকান্দি: ঠাকুরবাড়ি।

মতুয়াদের হরি বা ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করার একটি ধর্মীয় চর্চা হলো মাতম। অনেক জায়গায় এটিকে মাতাম বলে। মাতম হল এক ধরনের আধ্যাত্মিক নাচ। এই নাচের সময় ডঙ্কা-কাশি বাজিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। এই শব্দ হলো পবিত্রতার প্রতীক। মতুয়ারা মনে করে এই ডঙ্কা-কাশির শব্দ যতদূর পৌঁছাবে, ততোদূর রোগশোক, ব্যাধি, অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত থাকবে। এই ডঙ্কা কাশি বাজিয়ে মূলত একটি পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, পাশাপাশি শরীরে তেজ ও উদ্যম তৈরি করা হয়। ডঙ্কা কাশি বাজিয়ে নাচার সময় মতুয়ারা "হরিনাম" করে। তখন তারা "হরিবোল" জপতে থাকে। মাতমের নাচ অনেকটা শারীরিক কসরতের মতো। নারী পুরুষ একই সাথে নাচে। কোন লিঙ্গ ভেদ নেই। মতুয়ারা মনে করে এটা এক ধরনের আধ্যাত্মিক শরীর চর্চা যা দেহ মনকে পরিশুদ্ধ করে ও যাবতীয় অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করে। মনোজ কুমার (ছদ্মনাম)[৩] বলেন[৪],

> মাতমের সময় মতুয়াদের বাস্তব জ্ঞান কমে যায়। যখন সে হরিনাম করতেছে, তখন সে উলঙ্গ বা কি অবস্থায় আছে, সে জিনিসটা তার নিজেরই খেয়াল থাকে না। এরকম একটা নামে প্রেমে বিভোর হয়ে যায়। মাতুয়ারা হয়ে যায়। সেই মাতুয়ারা হওয়া থেকে মতুয়া নামটা এসেছে। মতুয়া নামটা আসার পেছনে অনেক ব্যাখ্যা আছে। এটা একটা অন্যতম বড় ব্যাখ্যা।

মাতম সম্পর্কে শিপ্রা মুখারজি বলেন মতুয়াদের নাচের প্রধান বার্তাটি হলো যে, এর মাধ্যমে তারা হেজেমনিক ধর্ম হিন্দু ও ইসলামের সীমা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চায় এবং তাদের উপর আরোপিত দাসত্বের অবসান ঘটায় (Mukherjee 2018, p. 38)। যখন থেকে মতুয়া ধর্মের বিকাশ শুরু, সেই উনিশ শতক থেকে মাতম চর্চিত হয়ে আসছে। এই নাচে মতুয়ারা সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে। মাতম এখানে একটি বার্তা হিসেবে কাজ করে যা মতুয়াদেরকে বর্ণ ব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে মুক্ত হওয়ার সহস দেয়। মাতম মতুয়াদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করে যা বিদ্যমান ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রতি এক ধরনের প্রতিবাদের ধরন হিসেবে বিকাশ লাভ করে। মাতমের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখার্জি বলেন ১৮৩৭ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যকার সময় ফরিদপুর জেলার কাশিয়ানি উপজেলার জোনাসুর গ্রামে একদল চণ্ডাল ডিক সাহেবের নীল কুঠির দিকে পদযাত্রা করে। ডিক সাহেব চণ্ডালদের দলনেতা হরিচাঁদ বিশ্বাসকে একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে তলব করে। ডিক সাহেব ছিলেন নীলকুঠির মালিক। নীল কুঠির দিকে যাওয়ার সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের সাথে একটি বড় সংখ্যক অনুসারী তার সাথে যাত্রা করে। বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে এটি প্রায় ২০০ থেকে কয়েক হাজার। অত্যাচার নিপীড়নের কারণে নীলকুঠির প্রতি কৃষক শ্রেণির মানুষের এক ধরনের

---

৩ As it is most common practice in the discipline of anthropology, the Review Board for ethical research of National University of Singapore requires us to use pseudonymes for all the names of our interlocutors in order to respect their privacy.

৪ উনার বাড়ি বরিশালে। কর্মসূত্রে পঞ্চগড়ে থাকেন। সাক্ষাতের তারিখ ১৭ অক্টোবর এবং ১৭ নভেম্বর ২০২০। মাধ্যম : মোবাইল কল (রেকর্ডেড)

বিদ্রোহী মনোভাব ছিল। যাত্রাপথে অনুসারীরা উদ্যমের সাথে নাচ করতে থাকে। এই নাচের মধ্যে ছিল এক ধরনের প্রতিরোধের ভাষা। ... যাত্রাপথে চণ্ডালেরা প্রভুর নাম জপতে জপতে নাচতে ও গাইতে থাকে। এটি কিছুটা বৈষ্ণব সঙ্কীর্তনের মতো দেখতে মনে হয়। কিন্তু পার্থক্য হলো, তাদের নাচে শুধু সঙ্কীর্তনের মতো ভক্তিই না, তাদের তেজ ও প্রাণশক্তি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে অবস্থান করে (Mukherjee 2018, pp. 37-38)। পরবর্তীতে মাতম মতুয়া ধর্মের প্রার্থনার একটি অনুষঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়ে যায়। ক্যারোলা বলেন, মতুয়া নামকরণের পূর্বে এই সম্প্রদায় হরিবোল নামে পরিচিত ছিল। কারণ ধর্মীয় উৎসব ও সমাবেশগুলোতে তারা একটানা "হরিবোল"[৫] জপতে থাকে। মাতমের সময় এটি অনেক বেশি লক্ষ্যণীয় (Lorea 2020, p. 3)। এই মাতম নাচে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উঁচু-নিচু ক্রম থাকে না। এ ধরনের চর্চা হিন্দু ধর্মের রীতিনীতিতে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ জানায় এবং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

মতুয়ারা পারিবারিকভাবে বা কোন গোষ্ঠী বা প্রতিবেশিরা সম্মিলিতভাবে 'মহোৎসব' নামে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান তিনদিনব্যাপী স্থায়ী হয় এবং রাতভর মাতম ও কীর্তন করা হয়। সাধারণত কারো জন্ম বা মৃত্যু দিবসকে কেন্দ্র করে মহোৎসবে পালিত হয়। এই উৎসবে একসাথে রান্না করে বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে একসাথে বসে খায়। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন আমিষ জাতীয় খাবার যেমন মাছ পরিবেশন করা হয় যা আবার বৈষ্ণব ধর্মীয় চর্চা থেকে ভিন্ন (Lorea 2020, p. 7)। মহোৎসবে বিভিন্ন মতুয়া দল আসে ডঙ্কা কাশি নিয়ে। তারা ডঙ্কা কাশি বাজিয়ে কীর্তন করে, মাতম করে। এই জন্য তাদেরকে অর্থ দিতে হয় না। তবে, যাত্রাপথে তাদের যেহেতু মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ হয়। সেই বিবেচনায় সন্মানী হিসেবে দলপতিকে যাতায়াতের খরচ প্রদান করা হয়। আর যারা দূর দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে আসে, তাদেরকে উপহার স্বরূপ পোশাক দেওয়া হয়। তাছাড়া, আঞ্চলিক পর্যায়ে কিছু মহোৎসব উদযাপন অনেক জনপ্রিয়। যেমন, ঝিনাইদহে একটি অনুষ্ঠান হয় পৌষ মাসের চৌদ্দ তারিখে। এর নাম চৌদ্দ মাদল। দুই দিন ধরে অনুষ্ঠানটি চলে। দুই দিনই কবিগান হয়। প্রথমদিন তো থাকে অধিবাস, পরের দিন ভোগ। প্রায় একশ জন গোঁসাই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসে। এছাড়া, বাগেরহাটের লক্ষীখালীতে কয়েক লক্ষ মতুয়ার সমাগম হয়, আবার সুন্দরবনের দুবলাচরের রাশউৎসবটাও মতুয়াদের কাছে মহোউৎসব হিসেবে বিবেচিত।

মতুয়াদেরপ্রধান ধর্মীয় উৎসব বারুণী মেলা উদযাপিত হয় 'মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী'তে। মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি। বাংলা বা ইংরেজি পঞ্জিকায় এর কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে ওড়াকান্দির ঠাকুর বাড়িতে তিন

৫ মতুয়া ধর্মে "হরিবোল" শব্দের "হরি" অর্থ হরিচাঁদ ঠাকুর এবং "বোল" অর্থ বানী। "হরিবোল" শব্দের অর্থ হচ্ছে হরিচাঁদ ঠাকুরের বানী। বার বার "হরিবোল" উচ্চারন করার মধ্য দিয়ে মতুয়ারা হরিচাঁদ ঠাকুরের বানী ও উপদেশকে মেনে চলাকে নির্দেশ করে। http://matuaism.blogspot.com/2015/12/blog-post_30.html

দিনব্যাপী স্নানোৎসব ও বারুণী মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই ঠাকুর বাড়িতেই হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধরদের বসবাস। বিশ্ব ইজতেমার পর এটিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় জমায়েত বা তীর্থযাত্রা বলে মনে করা হয়। ভারতের আন্দামান, দণ্ডকারণ্য ও উত্তরাখন্ড থেকে মতুয়া তীর্থযাত্রীরা আসে পবিত্র দীঘি 'কামনা-সাগর'-এ স্নান করার জন্য।

লোক চিকিৎসা আর ধর্মীয় চিকিৎসা

মতুয়াদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিষয় হল ধর্মীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটি এসেছে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে। মতুয়ারা ঠাকুরবাড়িকে এমন একটি স্থান হিসেবে কল্পনা করে যেখান থেকে সকল ধরনের রোগ ও বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এইজন্য সারা বছর ঠাকুর বাড়িতে মতুয়াদের যাতায়াত থাকে। মতুয়া ভক্তরা মনে করে বিজ্ঞান আজ আমাদের যা দিচ্ছে, ঠাকুরের দর্শনের মধ্যে সে বিষয়গুলো আছে। হরিঠাকুর যে ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করে স্থানীয় লোকজনদের চিকিৎসা দিতেন, এটিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। মতুয়ারা মনে করে এটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। যেমন, শ্যামল বিশ্বাস (ছদ্মনাম) বলেন[৬],

> উনি কি করতেন, জ্বর হলে পান্তা ভাতে তেঁতুল খেতে দিতেন। বেদনা হলে পিতলের থালায় তেঁতুল গুলা খেতে বলতেন। কারু গায়ে গুটিবসন্ত হলে গায়ে গোবর দিতে বলতেন, গোবর এবং গোমূত্র, চর্মরোগে হলুদ নিমপাতা বাটা, এরকম বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন..., যকৃৎ ব্যাধিতে কাঁচা পেঁপে রস দিয়েছিলেন খেতে, যকৃতের পীড়ায় কালো হয়ে গেলে পাকা রস, নিম পাতার রস কৃমি, হাম ও বসন্তের প্রতিশোধক হিসেবে, সাদা আমাশয়ে জাম পাতার রস, মৃগী রোগে ব্রাহ্মি পাতার রস নাকে দিতে এবং কলমি শাক খেতে বলতেন। অম্ল ও পিত্ত রোগে তেঁতুল গুলা জল, ঋতু পরিবর্তের সময়ে সর্দি জ্বরে তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে লবন দিয়ে পান্তা ভাত, কাঁচা লঙ্কা। জলশূন্য রোগে যা আজও ডাক্তারের হিসাবে প্রচারিত, উনি তখন ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগের জন্য পানি ফুটিয়ে খেতে বলতেন। মাতা অপুষ্টির শিকার হলে শিশু সুস্থ সবল, তাই কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে তিনি বন্ধ করতে বলেছেন। তিনি বাড়িতে গরু পালন করতে বলতেন, মায়েদের বুকের দুধ বৃদ্ধিতে কলমি শাক খেতে বলতেন, ব্যাথ্যা-বেদনায় ও রজক বন্ধে উলট কম্বলের পাতা ও শিকড়ের রস খেতে বলতেন। আর সর্বোপরি মনোবল বৃদ্ধিতে হরিনাম, কীর্তন করতে বলতেন। এই টুকটাক চিকিৎসা কিন্তু তিনি করতেন। এখন হলো কি, এটা অনেকে অনুসরণ করে...। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, যেহেতু উনি একজন অবতার ছিলেন, উনার মুখের বাক্যেই এটা ফলে যেত। যাকে যা বলতো তা খেয়েই সে সুস্থ হয়ে যেতো।

---

৬ মাঝবয়সী মানুষ। সরকারি কলেজে সহকারী অধ্যাপক। "শ্রী শ্রী হরি গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন"-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি। বরিশাল শহরে বসবাস করেন। সাক্ষাতের তারিখ ৭ নবেম্বর ২০২০। মাধ্যম : মোবাইল কল (রেকর্ডেড)।

লক্ষ্মীকালী: ক্যান্সার আক্রান্ত পরিবারের এক সদস্যের রোগমুক্তির জন্য কীর্তন করা হচ্ছে।
চিত্রগ্রাহক: ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া (২০১৯)

বর্তমানে মতুয়া গোঁসাইরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। গোঁসাইরা ধর্ম প্রচারক হলেও তাদেরকে আধ্যাত্মিক বৈদ্য বা আরোগ্যকর্তা বলা হয়ে থাকে। মনে করা হয়, গোঁসাইদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে যার দ্বারা তারা অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। তারা মুখে যা বলবে তাই সত্যি হবে (সেই ক্ষমতাকে বাকসিদ্ধি বলে)। এটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা যা ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। মতুয়ারা অসুস্থ হলে গোঁসাইদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। নিজে যেতে না পারলে মোবাইল ফোনে পরামর্শ নেয়। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শহরে বসবাস করে, ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে। পাশাপাশি গোঁসাইয়ের কাছ থেকেও পরামর্শ নিচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী বিধিনিষেধ পালন করছে। মতুয়াদের মধ্যে লোকে মুখে প্রচলিত আছে যে, গোঁসাইদের চিকিৎসার সুফল পেয়ে অনেক হিন্দু মতুয়া ধর্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে হিন্দু উচ্চ বর্ণের লোকজনও আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ঘটনা হলো কোন নারী সন্তান ধারণ করতে পারছে না, বা কেউ দুরারোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত, কিন্তু গোঁসাইয়ের কাছে যাওয়ার পর তার পরামর্শ অনুসরণ করে তিনি সন্তান ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন বা রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পরবর্তীতে দেখা গেল, ওই ব্যক্তি বা পরিবার মতুয়া আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। মাতমের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু মাতম ধর্মীয় প্রার্থনার বিষয় হলেও একে ধর্মীয় চিকিৎসার কাজেও ব্যবহার করা হয় এবং বর্তমান সময়ে একে বিভিন্ন চিকিৎসা পরিভাষার সাথে তুলনা করে দেখা হচ্ছে। এটিকে কখনো শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি ব্যায়াম

বলা হয়। কখনো শরীর চর্চাও বলা হয়। এই মাতমকে ব্যবহার করে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এটি হরিঠাকুরের সময় থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে। বাড়িতে যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকতো, তখন বলা হতো বাড়িতে সারারাত হরিনাম করতে। তখন দল নিয়ে বাড়িতে হরিনাম করা হয়। হরিনামের সাথে মাতম করা হয়।গ্রাম পর্যায়ে এই বিষয়টি এখনো প্রচলিত আছে। যখন কেউ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সারা রাত হরিনাম করা হয়।

মতুয়াদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হচ্ছে *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*। লীলামৃত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে এই ধর্মগ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে হয় । যারা পড়বে তারা একবারে পড়ে শেষ করে ফেলবে। সাধারণত একজন একা পড়লে ভুল হতে পারে। এজন্য পাশাপাশি আরও দু-একজন তার সাথে সাথে পড়বে। মানত রাখার কারণে এটা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা হয়, তাহলে যে উদ্দেশ্যে এটা পাঠ করা হবে, সেই কারণটায় সফলতা আসবে।

ওড়াকান্দিতে যে কামনা-সাগর আছে তার জলকে সর্বরোগের মহৌষধ বলে মনে করা হয়। মতুয়াদের বিশ্বাস, কামনা সাগরের জল যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পান করা হবে, তা পূরণ হবে। মতুয়াদের অনেকের ঘরে কামনা-সাগরের জল সংগ্রহ করে রাখা হয়, যা যেকোনো বিপদে আপদে ব্যবহার করা হয়।

বারুণী মেলার সময় মতুয়ারা কামনা-সাগরে গোসল করে, এতে তাদের দেহ-মন পরিশুদ্ধ হয় বলে তাদের বিশ্বাস। ঠাকুরবাড়ির মন্দিরে পূজার সময় যে পানি ব্যবহার করা হয়, সেই জল অসুস্থ রোগীদের আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় পান করানো হয় বা মাথায় দেওয়া হয়। তাছাড়া, ওড়াকান্দিতে যেখানে কীর্তন হয়, সেটিকে ধাম বলে। সেই ধামের মাটিকে মতুয়ারা বস্তু বলে। সেই মাটি মতুয়ারা ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কেউ অসুস্থ হলে সেই মাটি শরীরে বা মাথায় অল্প করে ব্যবহার করা হয়। অনেকে পানিতে মিশিয়ে পান করে। গুরুচাদ ঠাকুরের যে সমাধিক্ষেত্র আছে, সেটিকে সমাধি মন্দিরও বলা হয়ে থাকে। সেই সমাধিক্ষেত্রের মাটিও একইভাবে ব্যবহার করা হয়। এই মাটিকে খুব দামি ও পবিত্র জিনিস বলে মনে করা হয়। মানুষজন খুব অল্প করে নিজেদের জন্য নিয়ে যায়। কামনা-সাগরের জলের মতো ধামের বস্তুও মতুয়ারা তাদের বাড়িতে সব সময় সংরক্ষণ করে রাখে, যাতে বিপদের সময় ব্যবহার করতে পারে। কোন শুভ কাজে ঘর থেকে বের হবার সময়েও এই ধামের বস্তু, মাটি বা ধুলি ব্যবহার করা হয়।

আরও একটি বিষয় হল ঘটির জল। ঘটি হচ্ছে জল রাখার পাত্র বিশেষ। বাড়িতে বা মন্দিরে পূজার সময় ঘটিতে করে জল ব্যবহার করা হয়। সেই জলকে পবিত্র জল বলে মনে করা হয় এবং কামনা সাগরের জলের মতো করে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ঘটির জলের সাথে পানি মিশিয়ে অনেকে গোসল করে থাকে। মতুয়াদের যে দলপতি থাকে। তার হাতে একটি লাঠি থাকে। এই সোয়া হাত লাঠিকে সোটা বলে। সোটা হলো গার্হস্থ ধর্মের একটি প্রধান চিহ্ন। অনেক ভক্ত এই লাঠি ধৌত করে পানি পান করে। তা ছাড়া মতুয়াদের প্রধান একটা চিহ্ন হল নারকেলের মালা। কৃষ্ণ পন্থীরা

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতের পাঠের দৃশ্য। চিত্রগ্রাহক: ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া (২০১৯)

যেমন গলায় তুলসি মালা পরে, তেমনই মতুয়া পন্থীরা গলায় নারকেল মালা পরে। তাকে বলে আচার মালা বা 'ভক্তকণ্ঠের করঙ্গ হার'। এই মালার ইতিহাসের গল্প মধ্য দিয়ে বঝা যায় যে এই মালাটা গার্হস্থ ধর্মের একটা প্রতীক। মালাটা সারা রাত জলে ডুবিয়ে সেই জলটা সকালে খেলে বিভিন্ন রকম রোগ সরিয়ে যায় ।

মতুয়াদের মধ্যে জরিমানা রাখার একটি বিধান আছে। কেউ যদি কোন বিপদে পরে যেমন অসুস্থতা বা অন্য যেকোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যদিয়ে যায় তখন তারা ঠাকুরের নামে জরিমানা রাখে। যে ব্যক্তি বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, সে ঠাকুরের ধামে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পৌঁছিয়ে দেবে। এটিকে "পাঁচ সিকা জরিমানা রাখা" বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এখন যেহেতু "পাঁচ সিকা" পরিমান অর্থ মুদ্রাবাজারে নেই তাই লোকজন "পাঁচ টাকা" বা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করে। অনেকে কামনা-সাগরের জল ব্যবহার করার বিনিময় হিসেবেও জরিমানা দিয়ে থাকে।

মতুয়ারা মনে করে, হরিচাদ ঠাকুর ডাক্তার ছিলেন না, তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। এইজন্য তিনি যা বলতেন, তাই হতো। মতুয়া গোঁসাই, পাগলের মধ্যেও এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। তারা যা বলে তাই হয়। মানুষ বিভিন্ন শারীরিক মানসিক সমস্যা নিয়ে গোঁসাই, পাগলদের নিকট যায়।

সমকালীন বাংলাদেশে মতুয়া সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বর্তমান বাংলাদেশের ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেকোনো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মতো মতুয়া সম্প্রদায়ও নানাবিধ বাস্তবতার সম্মুখীন। মতুয়াদের

মধ্যে জীবনযাপনের জন্য একের অধিক কর্মসংস্থান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। আসলে, দলিত হিসেবে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মতুয়া জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে যায়। করোনা মহামারির কারণে এই সংকট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য তারা নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করছে। মতুয়া জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ জলাভূমি পরিবেষ্টিত অঞ্চলে বসবাস করে। কারণ, ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের হিসাবমতে বাংলা অঞ্চলে চণ্ডাল নামে যারা পরিচিত ছিল তাদের ৭৫% বসবাস করতো বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও খুলনায় (Bandopadhyay 1993, p. 149)। কৃষিকাজ নির্ভর মতুয়া সমাজকে তাই এরূপ পরিস্থিতিতে জীবনযাপনের জন্য একের অধিক কর্মসংস্থান খুঁজে নিতে হচ্ছে। কৃষিকাজ প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচিত হলেও তরুণ মতুয়াদের মধ্যে সরকারি চাকরিতে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের জরিপে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের শিক্ষার হার ৭১.৯৩% যেখানে প্রাদেশিক শিক্ষার হার ৬৮.৬৪%। নমঃশূদ্রদের ৬১.৭% বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত (Bandyopadhyay 2011, p. 262)। এইরূপ প্রবণতা বাংলাদেশের মতুয়াদের মধ্যেও স্পষ্ট কিন্তু এই সম্পর্কিত কোন পরিসংখ্যানগত উপাত্ত আমরা পাইনি। নমঃশূদ্রদের অতীত অভিজ্ঞতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছে শিক্ষা ও চাকরির দিকে মনযোগী হতে। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মনোশান্ত বিশ্বাস বলেন, একদিকে পুরাহিততন্ত্রের অমর্যাদা, ঘৃণা ও শোষণ এবং অপরদিকে ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার প্রতিবাদে আত্মজাগরণ ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে মতুয়ারা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করে (বিশ্বাস ২০১৬, পৃ : ৪১)। এই আন্দোলন প্রথাগত অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন সম্প্রদায়ের সূচনা করে। প্রতিবাদ তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ হলেও প্রতিনিয়ত মতুয়াদের সেগুলোর সাথে সমঝোতা করতে হচ্ছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ, চর্চা ও শাস্ত্রীয় বিধি মোতাবেক না হলেও করোনাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে মতুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, করোনাকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির সৎকার নিয়ে এক ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। জুলাই মাসে করোনা আক্রান্ত হয়ে মতুয়া ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তি মারা গেলে তার স্বজনেরা কেউ সৎকারের জন্য এগিয়ে আসেনি। স্বেচ্ছাসেবীরা সেখানে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় মৃতদেহ না পুড়িয়ে মাটি দিবে। পরিবারের সদস্যরা কষ্ট পেলেও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। আবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান মৃত্যুর এগারোতম দিনে করা বাধ্যতামূলক হলেও আর্থিক কারণে অনেকেই সেটা করতে পারেনি এবং ধর্মীয় গুরুরা সময় সুবিধা মতো তাদের সেগুলো পালনের পরামর্শ দেয়। আবার করোনাকালীন সময়ে হরিসভা, মাতম ও কীর্তনের মতো ধর্মীয় চর্চাগুলো সীমিত পরিসরে নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকলে মোবাইল ফোনে ধর্মীয় সংগীত ডাউনলোড করছে। সেগুলো শুনে পারিবারিক পরিসরে মাতম ও কীর্তন করেছে।

স্থানীয় প্রশাসন এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেশীরভাগ মতুয়ারা বারুণী মেলায় যাওয়া থেকে বিরত থেকেছে। এইক্ষেত্রে অনেকে পারিবারিকভাবে, আবার অনেকে মন্দিরকে কেন্দ্র করে একত্রে জমায়েত হয়ে বারুণী মেলা উদযাপন করে। কমল কুমার (ছদ্মনাম) জানায়[৭], ২০২০ সালের ঠাকুরবাড়ির বারুণী মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি বিধায় তার গ্রামের মন্দিরে বারুণী মেলা উদযাপন করে। সেখানে তারা হরিসভার পাশাপাশি চাল-ডাল দিয়ে মহাপ্রসাদ রান্না করে ও কীর্তন করে। মন্দিরের পাশে একটা পুকুর আছে। তারা সেই পুকুরটিকে কামনা-সাগর হিসেবে কল্পনা করে সেখানে বারুণী স্নান করে। এইক্ষেত্রে এই ধরনের চর্চাকে তারা ধর্মের বিপরীত হিসেবে দেখে না। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় সাধন করে ধর্মকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার পন্থা হিসেবে মনে করে। আলাপকালে অনেকে এমনটা বলেছেন যে ধর্ম যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দেশ-সমাজও গুরুত্বপূর্ণ। গুরুচাঁদ যেহেতু তাদেরকে সমাজবদ্ধ হয়ে একত্রে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তারা বারুণী মেলা আয়োজক কমিটির সিদ্ধান্ত ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা মেনে নিয়েছে। এটিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে স্থানীয় সমাজ কাঠামোতে টিকে থাকার কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

নারী অধিকার বিষয়ে বর্তমান সময়ে মতুয়াদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, গোঁসাই কিংবা নারী উদ্যোক্তারা সমগ্র মতুয়া নারী সমাজের বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে না। যদিও তারা নারী অধিকার আদায়ে সরব এবং মতুয়া ধর্মে নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেকটা ভিন্ন। গবেষণা চলাকালীন নারীদের উপস্থিতি গৌণ হিসেবে লক্ষ্য করা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীদের উপস্থিতি যেমন সীমিত। তেমনি নিজেদের স্বর উপস্থাপনের যেকোনো পরিসরেই তারা পিছিয়ে। একজন নারী গোঁসাই বলেন, "আমি খুব চাচ্ছি এখন এইরকম এই অবস্থায় যে মেয়েদের মনে এটা জাগুক যদিও নারী পুরুষ আমরা সমান বলি কিন্তু আসলে দেখা যায় সেই মর্যাদা পাওয়া যায় না"। একজন নারী উত্তরদাতা যিনি কিনা প্রায় বারো বছর ধরে দলিত আন্দোলনের সাথে জড়িত তিনি বলেন, নড়াইলে করোনার সময় প্রায় সাত আটজন মেয়ের বাল্যবিবাহ হয়। এরূপ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কিশোরীদের নিয়ে *ইয়েলো গ্যাং* নামে একটি সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন যেখানে কিশোরী মেয়েরা ধান কেটে দেয়, পাট কেটে দেয়, নিজেরা মতুয়া দল গঠন করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই ধরনের সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে নারীদেরকে নিজেদের ধর্ম এবং অধিকার নিয়ে সরব হবার পরিসর তৈরি করছেন তিনি। কেউ কেউ মনে করে শিক্ষিতরা ধর্ম চর্চায় আগ্রহী হয় না। অল্প বয়স্ক, শিক্ষিত ও শহুরে মতুয়ারা গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত মতুয়াদের মতো ধর্ম চর্চায় নিবেদিত না। এই উপলব্ধি থেকে করোনাকালীন সময়ে তারা অনেক

---

৭ ঝিনাইদহের নিজ গ্রামে বসবাস করছেন। সম্প্রতি ৩৫ টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত "মতুয়া গ্লোবাল অর্গানাইজেশনের" একজন কার্যকরী সদস্য। সাক্ষাতের তারিখ ১০ নভেম্বর, ১৮ নভেম্বর এবং ১০ ডিসেম্বর ২০২০ । মাধ্যম : মোবাইল কল (রেকর্ডেড)।

ফেসবুক গ্রুপ ও পেজ খুলে আলোচনা অনুষ্ঠান, ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক তথ্য প্রচার করছে, একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখছে। ফেসবুক লাইভের সংস্কৃতিকে মতুয়ারা নিজেদের ধর্মী চর্চার জন্য বেছে নিয়েছে। ধর্মীয় পূজাপার্বণ যেমন লাইভে দেখাচ্ছে তেমনি *হরিলীলামৃত* থেকে পাঠ করছে গোঁসাইরা। সামনাসামনি মাতম কীর্তনের আবেশ না পেলেও একজন গোঁসাই বলেন,

> পাঠ করে ভালো লাগলো। আমার এই পাঠ ভক্তরা মনঃপূতভাবে গ্রহণ করছে বলে আমি মনে করি। তবে অনুভূতি একই রকম হয় কী করে। যেখানে ভক্তরা সামনে থাকে সেই অনুভূতিটা আর যেখানে ভক্তরা সামনে নেই শুধু ঠাকুরকে সামনে রেখে পাঠ করা এই অনভূতিটা একটু ভিন্ন রকম হয়। যখন সামনে বসে ভক্তরা পাঠ করে তখন তো খুবই আনন্দঘন পরিবেশ থাকে। তখন ভক্তদের মুখের দিকে তাকাইলে পর মনেরও একটা প্রশান্তি জাগে বা তারাও হয়তোবা কিছু জানার জন্য বলে বা আমিও তাদের সাথে পাঠ করি ও দুটো কথা বলি। মানুষ একত্র হলে যে একটা চিত্তপূর্ণ বিনোদনের ব্যাপার থাকে সেটা তো আর সামনাসামনি না থাকলে হয় না।

মনোশান্ত বিশ্বাস (২০১৬)-এর মতে, মতুয়াদের সংস্কৃতিকে মধ্যযুগে ইউরোপের জনপ্রিয় সংস্কৃতির আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই সংস্কৃতির অভিজাত সংস্কৃতি থেকে 'বহিঃস্কৃতিকরণপ্রক্রিয়া'র প্রতিবাদস্বরূপ বিকাশ লাভ করে। যা একদিকে প্রতিনিধিত্বশীল সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়াগুলোকে ধারণ করে তেমনি আবার নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। এথনোগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একই অবস্থা প্রকাশ পায় যা তাদের অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে সহাবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ (পৃ: ২২০)।

কেউ কেউ ধর্ম ও বিজ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন একজন তরুণ উত্তরদাতা করোনাকালীন সময়ে তৈরি হওয়া নতুন নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের চেয়ে রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন। তবে তিনি একই সাথে দীক্ষিত হবার এবং সে বিষয়ক বিধিনিষেধ পালনের বিষয়টিকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। অপর একজন উত্তরদাতা বলেন,

> আমি তো নিশ্চয়ই করোনাকে বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখি। আর হচ্ছে এটা আমাদের একটা রোগ। তবে এটা ধর্মীয় দিক থেকে আমাদের যে সৃষ্টিকর্তা তিনি যদি কৃপা করেন তবে ব্যধি দূর হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক থেকে একটা বিশ্বাস আছে তবে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমাদের ঠাকুরই বলেছেন যে ধর্মের সাথে কর্মটাও করতে হবে।

মতুয়া ধর্মকে বলা হয় গার্হস্থ্য ধর্ম। অর্থাৎ ঘরে থেকে সকল সাংসারিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ধর্ম চর্চা। কারণ ঐ সময়কার নিম্নবর্ণের বেশীরভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ এবং কৃষিভিত্তিক সমাজে গার্হস্থ্য জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে মতুয়াদের জনপ্রিয় একটি হরিচাঁদ ঠাকুরের বাণী আছে "হাতে কাম মুখে নাম"। অর্থাৎ কাজকর্ম ও পরিশ্রমের সাথে সাথে হরিনামকে স্মরণ করা ও তাদের আধ্যাত্মিক

চেতনাকে জাগিয়ে রাখা। মতুয়া দর্শন অনুসারে ভক্তরা সংসারে থেকেই ধর্ম সাধনা করতে পারে। ত্যাগী সন্ন্যাসীর পথ না ধরে সংসারে অবস্থান করেই সাধনা করা যেতে পারে।

একজন গোঁসাই বলেন, কোভিড থেকে মুক্তির জন্য তিনি সারা রাত ধরে ভক্তদের নিয়ে মাতম কীর্তন করেছেন, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিষয়েও কঠোর ছিলেন। কোনো কোনো অঞ্চলে গোপনে মাতম কীর্তনের মতো ঘটনা ঘটেছে, আবার একই সাথে বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুনগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। আলাপকালে তাপস বসু থেকে জানা যায়, মতুয়ারা মনে করে মাতমের সময় কেউ করোনায় আক্রান্ত হবে না। কারণ মাতম করার সময় উচ্চ শব্দে ডঙ্কা কাশি বাজানো হয়। এই ডঙ্কা-কাশির শব্দ যেকোনো ধরনের রোগ জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। ফলে করোনা ভাইরাসের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং দেখা যায়, মাস্ক পরে মন্দিরে আসছে, সাবান পানি দিয়ে হাত ধুচ্ছে। মন্দিরে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বসছে। কিন্তু মাতমের সময় সবাই একসাথে মাতম করছে। রোগ সম্পর্কে সমাজের মানুষের ধ্যানধারণা এবং এর সাথে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামাজিক বোঝাপড়া এবং চর্চাগুলো আমাদেরকে যেকোনো রোগ সম্পর্কে সমাজের বহুমাত্রিক ধারণাসমূহ জানতে সাহায্য করবে।

করোনা সংক্রমণ ও সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের বারুণীমেলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বারুণীমেলায় অংশগ্রহণ করতে যাবে কি না বা যাওয়া ঠিক হবে কি না, এটি নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একটি অংশ মনে করে তাদের বারুনিমেলায় যাওয়া উচিত, সেখানে গেলে তারা করোনা আক্রান্ত হবে না। বরং রোগমুক্তির সম্ভাবনা আছে। আরেকটি অংশ মনে করে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে ও করোনাকালীন সচেতনতা হিসেবে এইবার বারুনিমেলায় অংশ নিতে না যাওয়াটা ভালো। তা সত্ত্বেও অনেক মতুয়াদের বারুনিমেলায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে দেখা যায়। করোনাকালীন সময়ে রাস্তায় যানবাহন না পেয়ে, ওরাকান্দি পৌঁছালেও প্রশাসনিক নজরদারির কারণে ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করতে না পেরে অনেকেই ফিরে আসে, আবার অনেকে রাস্তায় বা আশেপাশের খালি জায়গায় অবস্থান করে। তখন দেখা যায় যারা ঠাকুরবাড়িতে যেতে পেরেছিল, তারা ঠাকুরবাড়ির হরিমন্দির, অংশগ্রহণকারীদের মাতম ও কীর্তন ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করে। যারা যেতে পারেনি, তারা তখন এই সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিওর মাধ্যমে মেলায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে। ভিডিও দেখে দেখে তারা বারবার "হরিবোল" বলে হরিধ্বনি দিতে থাকে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১৯ শতকের শুরুর দিকে নিম্নবর্ণের ভারতীয়দের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, যা পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির দিকে ধাবিত করে। এই আন্দোলনগুলোতে শুরুর দিকে সামাজিক মর্যাদা অর্জনের বিষয়গুলো প্রাধান্য পেলেও, পরে সামাজিক মর্যাদার সাথে যুক্ত বস্তুগত উপাদানগুলোর দিকে

গুরুত্ব দেয়। যেমন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। সেনগুপ্ত বলেন, উনিশ শতকে প্রান্তিক ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর সম্প্রদায়গত যৌথতা তৈরির প্রধান উপকরণ ছিল শিক্ষা। তখন সকল ধরনের সভা সমাবেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা ওই সম্প্রদায়ের শিক্ষার অধিকার নিয়ে কথা বলতো (Sengupta 2012)। ভারতের বিভিন্ন জাতিবর্ণের অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়গুলো একত্রিত হয়ে বেশ কিছু শক্তিশালী আন্দোলনের বিকাশ ঘটায়। এই বিষয়টি মতুয়া আন্দোলনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। আগেই বলা হয়েছে, প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মীয় অধিকার, ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভাব ও অন্যায্য আচরণ নিয়ে যে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, পরে তার সন্তান গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষাকেও মতুয়া আন্দোলনের একটি প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে যুক্ত করেন। কারণ, তিনি মনে করেন শিক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমাজের উঁচু স্তরে উঠা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকে হিন্দু ভদ্রলোকরা চেয়েছিল উচ্চ বর্ণের আধুনিকতা (high caste modernity)। উপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয় উপমহাদেশে যে ইউরোপীয় আধুনিকতার ধারণা দেয়, সেই আধুনিকতার ধারণার সাথে ভদ্রলোকরা হিন্দু উচ্চ বর্ণের আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সমাজে যে রূপান্তর ঘটায়, সেটিই মূলত উচ্চ বর্ণের আধুনিকতা। নিম্নবর্ণের ভারতীয়রা ছিল সেই আধুনিকতার বাইরে। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের তাদের নিজেদের বিপরীতে স্থাপন করলে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকরা সমাজে নিজেদের শ্রেণিগত উঁচু অবস্থান তৈরির জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দু, আদিবাসী, ও মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীতে স্থাপন করে। এদেরকে দেখা হয় ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক অন্য হিসেবে (Sengupta 2012)। এই কারণে ভদ্রলোকের আধুনিকতার সাথে বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীর দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার সাথে তারা নিজেদের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনটাই ঘটেছে দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া আন্দোলনে। ১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে সংগঠিত হওয়া স্বদেশী আন্দোলনকে তারা বর্জন করে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের একটি পিটিশনে তারা বিবৃতি দেয় যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং দাবি করে তাদেরকে যেন একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (Bandopadhyay 1993, p. 155)। নমঃশূদ্র বা দলিত আন্দোলন প্রসঙ্গে গবেষক বলেন যে, এই সকল আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে বিপরীত অবস্থান দেখা যায়। কারণ, উপনিবেশিক সরকার এসব আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা করছিল, আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উপর তাদের ভরসা ছিল না (Bandopadhyay 1993, p. 147)। এই প্রসঙ্গে এটিও বলা যায় যে, বিদ্যমান সামাজিক অসমতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তারা এই পন্থা অবলম্বন করে।

দেশভাগের পর মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মতুয়া আন্দোলনে একটি ছেদ পড়ে এবং আন্দোলনটির একতা নষ্ট হয়ে যায়। মতুয়ারা তখন বাংলাদেশ-ভারত দুই ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া মনে করেন, মতুয়া সম্প্রদায় একটি রাজনৈতিক সাবজেক্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে

বিশেষ করে রিফিউজি পলিটিক্স, সীমান্ত ইস্যু, হিন্দু জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে (Lorea 2020, p. 1)। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ভারতের সাম্প্রতিক ভোটের রাজনীতিতে মতুয়ারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে সাম্প্রতিক ভারতের ভোটের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান থেকে দেখা যায়, হিন্দু পরিচয়কে নিয়ে ভারত রাষ্ট্রে যে বলয় নির্মাণ করা হচ্ছে, মতুয়াদেরও সেই বলয়ের অংশ হিসেবে তাদের ভাবানো হচ্ছে এবং এই কারণে ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল হিন্দুত্ববাদী আচরণের ও পরিচয়ের বাইরে বের হওয়াটা মতুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ঐতিহাসিক একটি কারণ রয়েছে। ১৯৪৭ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ধর্মীয় কারণে হিন্দুদের একটি বড় অংশ ভারতে অভিবাসিত। আবার বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের ক্ষেত্রে মতুয়াদের হিন্দু বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে পাওয়া মতুয়াদের অভিজ্ঞতা ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল হিন্দু মতাদর্শ ও ডিসকোর্সের সাথে মিলে যায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দাঙ্গার রাজনৈতিক পরিবেশন ও পরিচিতি নির্মাণ প্রক্রিয়া কিভাবে মতুয়াদের ডমিন্যান্ট হিন্দু ন্যারেটিভের অংশ করে দেয়, সেটা দেখা যায় ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গে ঘটে যাওয়া দাঙ্গা এবং এর ফলে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও মতুয়াদের ভারতে অভিবাসন ইস্যুতে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু অভিবাসনকে দুইটি ধাপে দেখান, প্রথম ধাপে পশ্চিমবঙ্গে যায় হিন্দু ধনী, মধ্যবিত্ত ও নমঃশূদ্র মধ্যবিত্তরা। কারণ, দেশ ত্যাগ করতে যে অর্থের প্রয়োজন হতো, নমঃশূদ্রদের পক্ষে সে অর্থের সংস্থান করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় ধাপে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নমঃশূদ্ররা পাকিস্তান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, ১৯৫০-এর কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের পাকিস্তান রাষ্ট্র হিন্দু নাশকতাকারী বলে আখ্যা দেয়। এতে দেখা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানের সাথে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে জড়িয়ে দেয়। কলকাতার সংবাদমাধ্যমে নমঃশূদ্রদের দেখানো হয় হিন্দু হিসেবে। অর্থাৎ, এরা কমিউনিস্ট না, নমঃশূদ্রও না (Bandyopadhyay 2011, pp. 251, 252)। এর ফলে কলকাতায় যে রায়ট হয়, পূর্ব পাকিস্তানে তার শিকার হয় নমঃশূদ্ররা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যে ধর্মীয় অন্যতা নির্মাণ করা হয়, যেখানে সকল পরিচয় ছাপিয়ে দলিত বা নমশূদ্ররা হয়ে উঠে হিন্দু, যারা আবার পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের কাছে আদর্শ হিন্দু না। কিন্তু দুই দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছত্রছায়ায় তাদেরকে হিন্দু পরিচয়ে মোড়ানো হয়। আলাপকালে সন্দীপন বিশ্বাস বলেন, "সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা যখন আসে তখন মতুয়াদের হিন্দু বলা হয়। এই কারণে অনেক মতুয়া ভারতে চলে যায়"। বর্তমান ভোটের রাজনীতি, নাগরিকত্ব ও সীমান্ত ইস্যু, বাংলাদেশে ভারতের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এই সকল দিক বিবেচনায় সাম্প্রতিক সময় ও ঘটনা প্রবাহকে বিশ্লেষণে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে অনীহা। মতুয়া সম্প্রদায়ের সংগঠক ও বুদ্ধিজীবীদের এই বিষয়টি আলোকপাত করতে দেখা যাচ্ছে না। তারা মতুয়াদের অধিকার প্রসঙ্গে যেভাবে কথা

বলছে ও কর্মপন্থা বেঁছে নিচ্ছে, তা একদিকে যেমন ইতিহাস বিচ্যুত, অপরদিকে রাজনৈতিক বোঝাপড়া বিহীন। এর ফলে দেখা যাচ্ছে মতুয়ারা ভারতের তৈরিকৃত প্রবল হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের গণ্ডীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি (২৬শে মার্চ ২০২১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ সফর করেন। এটি নিয়েপ্রায় সকল মতুয়াদের মধ্যেই ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। এখানে এই বিষয়টি সত্য যে এখানে ভারতে অবস্থানরত মতুয়াদের ভোট ব্যাংক একটি বড় ক্রীড়ানক। কারণ, মতুয়ারা ভৌগলিকভাবে দূরে অবস্থান করলেও তারা সকলেই একটি কাল্পনিক সুতোয় একই সূত্রে বাঁধা। নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ভ্রমণ ভারতে বসবাসরত মতুয়াদের তার রাজনৈতিক দলের দিকে টানবে, এই ধারণা থেকেই তাঁর বাংলাদেশের ওড়াকান্দি ভ্রমণ। যেহেতু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অংশ মতুয়াদের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার বাসিন্দা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার মোট ৫০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩২-৩৩টিতে মতুয়া ভোট অনেকটাই বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চলাকালে ওড়াকান্দিতে মোদির এই সফর রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ("PM Modi Bangladesh", 2021)। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মতুয়াদের নাগরিকত্ব ইস্যুকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও মতুয়াদের সখ্যতা গড়ে উঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ঠাকুর পরিবারেও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কারণ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের বিধানসভা নির্বাচনে বড় ছেলে কপিল কৃষ্ণ বামফ্রন্টের হয়ে নির্বাচন করেন ও ছোট ছেলে মঞ্জুল কৃষ্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন করেন। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্জুল কৃষ্ণ জয়লাভ করেন (Bandyopadhyay 2011, pp. 271, 272)। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এই বিষয়গুলোর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ জরুরি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পূর্বে যাদেরকে চণ্ডাল হিসবে অভিহিত করা হয় যারা ছিল মূলত অচ্ছুৎ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও ভোটের রাজনীতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুকে বাধ্য করছে সেই "চণ্ডাল" বা নমঃশূদ্রের প্রার্থনালয়ে প্রবেশ করতে। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা জাতিবর্ণের ক্রমোচ্চতাকে আজ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এর ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি কেমন হতে পারে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়ন জরুরি। এই ধরনের অধ্যয়নগুলো আমাদেরকে ধর্ম, জাতিবর্ণ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়কে ইতিহাসের নিরিখে নতুনভাবে পাঠ করতে সাহায্য করবে।

বর্তমান মতুয়া সম্প্রদায় ও তাদের সামাজিক বাস্তবতা

আমাদের গবেষক দল বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মতুয়াদের সাথে আলাপ আলোচনার সময় মতুয়াা সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ লোকজন আমাদের জানায় যে, কোন মতুয়া করোনায় ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের সরল বক্তব্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সেটি হল এর ফলে এই সম্প্রদায়ের মানুষ

বিশ্বাস করতে থাকে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস তাদেরকে করোনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম যা তাদেরকে একটি ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতির দিকে নিয়ে যায়। তেমনটিই উঠে এসেছে মনোজ কুমারের বক্তব্যে,

> তারা মনে করে কামনা-সাগরে ডুব দিলে কোন রোগ ব্যাধি এবং কোন রকম কষ্ট মানুষের থাকবে না। এবং ঠাকুরবাড়ির যে ধাম থেকে মানুষ, মানে কোভিড বলেন আর যাই বলেন, যেকোনো রোগের জন্যই যে বিষয়গুলো তারা ব্যবহার করে, ঠাকুরবাড়ির মাটি, জল, এইগুলা তারা ব্যবহার করে। এবং যেইখান থেকে তারা এইটা ব্যবহার করে সেখানে যেতে তারা ভয় পায় না।

এইগুলো শুধু মতুয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনা ও চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই ধরনের বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাসমূহ মতুয়ারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন গ্রুপ ও পেজে প্রচার করেছে। অপরদিকে কামনা-সাগরকে নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে এই ধরনের বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা আছে বলেই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের বারুণী মেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে করোনার সতর্কতা, সরকার ও প্রশাসনের ব্যাপক বিধিনিষেধকে অমূলক মনে করে। মেলায় যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যে সকল বাঁধা ও বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়, সেগুলো তাদেরকে যৌথ ও একত্রবদ্ধ হতে অনেক বেশি সাহায্য করেছে। কমল মালাকার (ছদ্মনাম) বলেন[৮], "বছরে একবার হাজিরা ওড়াকান্দিতে দিতে হবে যদি তার সক্ষমতা থাকে। সে সময়টাতে যদি তারা যেতে না পারে, তাহলে নিশ্চয় তাদের মানসিক কষ্ট, আমার আধ্যাত্মিক যে সফলতা, সেখানে বিঘ্ন ঘটছে, সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।" মতুয়ারা মনে করে বারুণী মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি বিধায় তাদের আধ্যাত্মিক সাফল্য বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস বারুণী মেলায় অংশগ্রহণ করে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর কেউ যদি সেখানে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তারা মনে করে এটি মৃত ব্যক্তির জন্য পরম আধ্যাত্মিক সাফল্য। যারা বারুণী মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল, তারা ফেসবুক লাইভে ও টাইমলাইনে বারুণী মেলার ভিডিও ও ছবি প্রাচার করে। সেখানে দেখা বিভিন্ন কমেন্ট দেখা ধারণা করা যায় যে, এই ভিডিও এবং ছবিগুলো মতুয়াদেরকে একটি যৌথ সম্প্রদায় হিসেবে ভাবতে সহায়তা করেছে। তবে ভক্তদের মধ্যে একটি প্রশ্নাতীত একতা লক্ষ্য করা গেলেও, ধর্মীয় মতবাদ ও স্থানীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, করোনা মহামারীর শুরুর দিকে ৩৫ দেশে অবস্থানরত মতুয়াদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন করা হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বের মতুয়াদের একটি একক পাটাতনে নিয়ে আসা এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার সৌহার্দ্য ও একতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই সংগঠন আবার সকল মতুয়াদেরকে প্রতিনিধিত্ব করে না বলে অভিযোগ রয়েছে এবং এটি নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত লক্ষ্যণীয়।

---

৮ পেশাঃ প্রকৌশলী। বয়স ৩৭। ঢাকাতে থাকেন, করোনার কারণে উনি গ্রামের বাড়িতে বরিশালের উজিরপুর গিয়েছিলেন। সাক্ষাতের তারিখ ১২ নভেম্বর এবং ১১ ডিসেম্বর ২০২০। মাধ্যম ফোন কল (রেকর্ডেড)

ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণীয় না বর্জনীয় এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির সাথে অনেক মতুয়াদের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে সুধীর রঞ্জন হালদার (২০১৭) বলেন, লীলাগ্রন্থেই তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচরণে ডুবে থাকার ব্যবস্থাটাও রেখে গিয়েছেন। অনেকেই হয়ত এ কথা শুনে চমকে উঠবেন এবং আমাকে গালাগালি দিতেও দ্বিধা করবেন না। কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে "শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত" গ্রন্থেই স্ববিরোধী উক্তিতে ভরে রেখেছেন মহাকবি তারকচন্দ্র (পৃষ্ঠা ৭)।

এই বিতর্কের সূত্র ধরে মতুয়ারা দুই দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি ও দ্বন্দ্বিক অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আলাপকালে কমল কুমার (ছদ্মনাম) বলেন,

> মতুয়াদের মধ্যে হলো দুই ধরনের মতুয়া। একটা হচ্ছে সংস্কারপন্থী, আরেকটা হচ্ছে সংস্কার বিরোধী। সেক্ষেত্রে আমি একটা সংঘটনের নাম বলতে পারি "বিশ্ব মতুয়া পরিষদ"। যারা হচ্ছে সংস্কারবাদি কাজ করে থাকে মতুয়াদের মধ্যে। তারা কোন মতুয়া মারা গেলে তারা গলায় ধরা বাধে না, মস্তক মুণ্ডন করে না। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রীয় যে নিয়ম আছে, সেটা তারা পালন করেন না। আর কিছু আছে যারা কুসংস্কারবাদী আর কি। তারা হলো এই মানে প্রথাগত যে হিন্দু ধর্ম সেটা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে নি।

ইউটিউব, ফেসবুক ও নিজেদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনেক মতুয়াকে ব্রাহ্মণ্যবাদের পক্ষে বিপক্ষে নিজেদের মতামত ও বক্তব্য তুলে ধরতে দেখা যায়। এরকম বিতর্কের কারণ হিসেবে ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবকে দায়ী করছেন অনেকে। তারা বলছে ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করলে এই বিতর্কটি ভবিষ্যতে থাকবে না। যেমন তমাল রায় (ছদ্মনাম) বলেন*,

> আমাদেরটা কিন্তু মতুয়া ধর্ম কেবল শুরু। মানে এই যে এতদিন আমরা বলছি, আমাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন বলছে যে এটা ধর্ম না। এটা একটা মত। এটা হিন্দু ধর্মের একটা শাখা হিসেবে একটা মত প্রচলিত ছিল। আমার জেনারেশন, শিক্ষিত জেনারেশন যখন যারা বুঝতে পারছে যে আমরা কোথা থেকে এলাম আর কিভাবে এলাম। যখন এগুলো বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে, তখনই তারা কিন্তু মতুয়া ধর্ম নামে প্রকাশ করছে এবং মতুয়া ধর্ম নামে নিজেদেরকে জাহির করার চেষ্টা করছে বা বলছে।

এইরকম একটি ধারণা কিছু হিন্দুদের মধ্যেও আছে। মতুয়া ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন ফেসবুক প্রচার প্রচারণায় দেখা যায়, কিছু কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বী মন্তব্য করে যে, মতুয়ারা ভুল ধর্মের পথে আছে বা মতুয়া কোন স্বতন্ত্র ধর্ম নয়। তাদেরকে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় নির্দেশ ও পদ্ধতি অনুসরণ করার আহ্বান জানায়। কাউকে আবার বিরূপ মন্তব্য করতে

---

৯ পেশা: শিক্ষক। রমনা হরিমন্দিরের প্রচার সম্পাদক। সাক্ষাতের তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর ২০২০। মাধ্যম: ফোন কল (রেকর্ডেড)।

দেখা যায়। অনিল কুমার (ছদ্মনাম)[১০] প্রায় বিশ বছর ধরে সিলেট জেলায় মতুয়া ধর্ম প্রসারে কাজ করেন। তিনি জানান ধর্ম প্রচারের শুরুর দিকে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই বঞ্চনার শিকার হোন। যেমন সিলেটের মতুয়ারা রাজা গোবিন্দের আখড়ায় তাদের প্রথম ধর্মীয় সম্মেলন করতে গেলে মুসলমানদের বাঁধার সম্মুখীন হয়। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর পুর্বে তারা সিলেট জিন্দাবাজারের মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দুর্গা মন্দিরে হরিসভা করা শুরু করেন। কিছুদিন পর মন্দির কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে সেখানে সপ্তাহিক হরিসভা করা বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর তারা সবাই নিজ নিজ বাসায় ছোট পরিসরে আয়োজন করতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে সিলেটে মতুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মতুয়া ধর্ম সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে বিধায় এখন আর এই ধরনের সমস্যা হয় না। বাংলাদেশের জনপরিসরে মতুয়া ধর্মের উপস্থিতি গৌণ হবার কারণ হিসেবে তমাল রায় প্রচার প্রচারণাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, "এই মতুয়াদের মধ্যেই কিন্তু জনসংখ্যা বেশি বাংলাদেশে। হিন্দুদের মধ্যে এই ধর্মের অনুসারী আশি ভাগ (৮০%), হে। কিন্তু প্রচার, প্রসার এইটা একটু কম। কিন্তু এটা আগামী ত্রিশ বছর নাগাদ দেখবেন যে সব জায়গায় আমরা আছি।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মতুয়ারা নিজেদেরকে একটি এক অভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের যেমন ভাবছে তেমনি ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে সংকট ও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। এই বিষয়গুলো তারা আবার নিজস্ব কৌশল ও স্থানীয় সমাজ কাঠামোর সাথে সমন্বয়ের মধ্যদিয়ে নিজেদের অবস্থানকে নিশ্চিত করছে।

গ্রন্থপঞ্জি

বিশ্বাস, মনোশান্ত। (২০১৬)। *বাংলার মতুয়া আন্দোলন: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি*। কলকাতা: সেতু প্রকাশনী।

সরকার, তারকচন্দ্র। (১৯১৬[১৩২৩ বঙ্গাব্দ])। *শ্রীশ্রী হরিলিলামৃত* (১ম সংস্করণ)। কলকাতা: শাস্ত্রপ্রচার প্রেস।

হালদার, সুধীর রঞ্জন। (২০১৭)। *মতুয়াধর্ম প্রসঙ্গে: মতুয়াধর্ম প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা*। নদিয়া: কমলা পাবলিশার্স।

Bandopadhyay, S. (1993). A Peasant Caste in Protest: The Namasudras of Eastern Bengal, 1872-1945. In S. Das & S. Bandopadhyay (Eds.), *Caste and Communal Politics in South Asia* (Department of History, University of Calcutta, Monograph 8) (pp. 145-190). Calcutta: K P Bagchi & Company.

Bandyopadhay, S. (2004). *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal.* New Delhi; Thousand Oaks; London: Sage publications.

১০ কলেজের ইংরেজির শিক্ষক। থাকেন সিলেট সদরে, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জে মতুয়া ধর্ম প্রচারের সাথে যুক্ত। সাক্ষাতের তারিখ ৫ নভেম্বর , ১৪ নভেম্বর এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ । মাধ্যম ফোন কল (রেকর্ডেড)।

Bandopadhyay, S. (2011). *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras Of Bengal* (2nd edition). Delhi: Oxford University Press.

Barkat, A., Zaman, S., Khan, M. S., Poddar, A., Hoque, S., & Uddin, M. T. (2008). *Deprivation of the Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property.* Dhaka: Pathak Shamabesh.

Barkat, A. (2016). *Political Economy of Reforming Agriculture-land-water Bodies in Bangladesh.* Dhaka: Muktobuddhi Prokasana.

Barnard, A. & Spencer, J. (2002). *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.* London: Routledge.

Biswas, M. (2018). Caste and Socio - cultural Mobility in West Bengal: A Hybrid Cultural Elocution of Matua Reforms Movement. *Contemporary Voice of Dalit,* 10(2), 232 - 243. doi:10.1177/2455328X18787568.

Chakraborti, R. (1985). *Vaishnavism in Bengal: 1486 - 1900.* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar.

Hine, c. (2000). *Virtual Ethnography.* London: Sage

Lorea, C. E. (2020, February 28). Religion, Caste, and Displacement: The Matua Community. *Oxford Research Encyclopedia of Asian History.* Retrieved 6 Apr. 2021, from https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-428.

Lorea, C.E. (2020). Contesting Multiple Borders: Bricolage Thinking and Matua Narratives on the Andaman Islands. *South Asian Studies,* 9 (3), 231-276.

Lupton, D. (editor) (2020) Doing Fieldwork in a Pandemic (crowd-sourced document). Available at: https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts=5e88ae0a#

Mukherjee, S. (2018). To the Rhythm of the Matua Dance: Breaking the Fetters to Imagine Anew. In S. D. Gupta & A. Prakash (Eds.), *De-centring Dominant Narratives in India: Alternative Perceptions of History and Development* (pp. 37-50). Rome: Fabrizio Serra.

Pacheco-Vega, R. (2020, March 16). Fieldwork in the Times of COVID-19: Doing Ethnography During a Pandemic [Blog post]. Retrieved 8 April 2021 form http://www.raulpacheco.org/2020/03/fieldwork-in-the-times-of-covid-19-doing-ethnography-during-a-pandemic/

PM Modi Bangladesh Visit: 'জয় হরিবোল' ধ্বনি, শান্তনু ঠাকুরের প্রশংসা, ওড়াকান্দিতে মতুয়া মন্দিরে পুজো দিয়ে বার্তা মোদির (27 March 2021). *ABP Ananda.* Retrieved 6 April 2021 from https://bengali.abplive.com/news/aaj-focus-e/pm-modi-bangladesh-visit-narendra-modi-offers-prayers-at-orakandi-matua-temple-in-bangladesh-807520.

Sengupta, P. (2012). *Pedagogy for Religion: Missionary Education and the Fashioning of Hindus and Muslims in Bengal.* New Delhi: Orient Blackswan.

Srinivas, M.N. (1972). *Social Change in Modern India.* Delhi: Orient Longman.

Uddin, M.N. (2017). Caste Based Discrimination and Dalit Communities of Bangladesh: Reflections on Conceptual and Empirical Challenges. *Rajshahi University Journal of Anthropology,* 1.